অন্নদাশঙ্কর রায়ের জীবনী

শাহীদা আখতার

অন্নদাশঙ্কর রায় (১৫ মার্চ ১৯০৪ - ২৮ অক্টোবর ২০০২) ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, কবি, ছড়াকার, ছোটগল্পকার, ভ্রমণকাহিনী রচয়িতা এবং প্রখ্যাত চিন্তাবিদ। উনিশ শতকের বাঙালি রেনেসাঁর ধারক শেষ বুদ্ধিজীবী হিসেবে অভিহিত। ওড়িশার দেশীয় রাজ্য ঢেঙ্কানালের এক শাক্ত পরিবারে অন্নদাশঙ্কর রায়ের জন্ম। তাঁর পিতার নাম নিমাইচরণ রায় ও মা হেমনলিনী। তাঁর পূর্বপুরুষের আদি নিবাস ছিল পশ্চিম বঙ্গের হুগলি জেলার কোতরং গ্রামে। কর্মসূত্রে তাঁরা ওড়িশার ঢেঙ্কানালে বসবাস শুরু করেন। বাদশাহ আকবরের আমলে তাঁদের পূর্বপুরুষ রামচন্দ্র ঘোষ সুবে ওড়িশা জরিপ করতে যান টোডরমলের সঙ্গে। বাদশাহ জাহাঙ্গীর রামচন্দ্র ঘোষকে একটি লাখেরাজ তালুক ও খান পদবি দেন। সেই থেকে তাঁর পরিবার ওড়িশায় বসবাস আরম্ভ করেন। মোগল আমলেই খান পদবির সঙ্গে যুক্ত হয় রায় চৌধুরী, তবে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে রায়। পরিবারের শরিকদের মধ্যে তালুক ভাগাভাগি হয়ে যাওয়ায় অন্নদাশঙ্করের পিতামহ দেশান্তরী হন। তাঁর পিতা নিমাইচরণ রায় ঢেঙ্কানালে রাজ্য সরকারের চাকরি পেয়ে সেখানেই স্থায়ী হন।

জমিদার হিসেবে অন্নদাশঙ্করের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন প্রজাহিতৈষী, মানবতাবাদী ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী। এ ছাড়া তাঁদের পরিবারে সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা হতো। পিতামহ শ্রীনাথ রায়, পিতা নিমাইচরণ রায় ও কাকা হরিশচন্দ্র রায়-এঁরা সবাই ছিলেন সাহিত্যরসিক এবং শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। তাঁর পিতা নিমাইচরণও লিখতেন। এক বন্ধুর সঙ্গে মিলে 'শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত' অনুবাদ করেন ওড়িয়া ভাষায়। নিমাইচরণ রায় বিয়ে করেন কটকের বিখ্যাত পালিত পরিবারে। পালিতদের পারিবারিক পরিমণ্ডল ছিল সমসাময়িক কোলকাতার ধাঁচের। চলনে বলনে পোশাকে তাঁরা আধুনিক বাঙালি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর মা হেমনলিনী ছিলেন বৈষ্ণব ভাবাদর্শে বিশ্বাসী। একই পরিবারে শাক্ত ও বৈষ্ণব - দুই বিশ্বাসের সংঘাত ঘটে নি। সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাতাবরণ অন্নদাশঙ্করের মানস গঠনে সহায়ক হয়। অধিকন্তু প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিশ্র পরিবেশে কেটেছে তাঁর শৈশব। নিমাইচরণ রায়ের পাঁচ সন্তানের মধ্যে অন্নদাশঙ্কর সবার বড়। পিতার সুযোগ্য পুত্র হিসেবে তিনি পারিবারিক অনেক দায়িত্ব পালন করেন।

অন্নদাশঙ্করের শিক্ষাজীবন আরম্ভ হয় ঢেঙ্কানালের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ১৯২১ সালে ঢেঙ্কানাল হাইস্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। একই বছর তিনি ভর্তি হন কটক র‍্যাভেন্‌শ কলেজে। কলেজটি তখন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল। ১৯২৩ সালে আই.এ পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। তারপর

পাটনা কলেজে পড়তে যান এবং ১৯২৫ সালে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্সসহ বি.এ পরীক্ষায় তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। এরপর তিনি ইংরেজিতে এম.এ পড়া শুরু করেন এবং একই সঙ্গে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসেস প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। ১৯২৭ সালে অন্নদাশঙ্কর রায় আই.সি.এস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে প্রশিক্ষণের জন্য ইংল্যান্ড যান। সেখানে তিনি লন্ডনের 'ইউনিভার্সিটি কলেজ', 'কিংস কলেজ', 'লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকস', 'লন্ডন স্কুল অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ'-এ পড়াশোনা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এরই ফাঁকে ঘুরে বেড়ান সুইজারল্যান্ড, জার্মানি, ইটালি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ। এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটে তাঁর সাহিত্যে। কলেজে পড়ার সময় অন্নদাশঙ্করের স্বপ্ন ছিল সাংবাদিক হওয়ার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায় এবং তিনি হলেন একাধারে আই.সি.এস অফিসার ও সাহিত্যিক।

১৯২৯ সালে অন্নদাশঙ্কর রায় ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে অ্যাসিসট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট পদে যোগ দেন। পরাধীন ভারতবর্ষে ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রায় আঠারো বছরের মধ্যে তিনি নয় বছর পশ্চিমবঙ্গে এবং নয় বছর পূর্ববঙ্গে বিভিন্ন পদে নিয়োজিত ছিলেন। অবিভক্ত বঙ্গের মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুষ্টিয়া, নদীয়া, ত্রিপুরা, মেদিনীপুর, হুগলি, হাওয়া এবং স্বাধীন ভারতের কোলকাতা ও মুর্শিদাবাদে তিনি নিযুক্ত ছিলেন কখনো শাসন বিভাগে, কখনো বিচার বিভাগে যথাক্রমে ম্যাজিস্ট্রেট ও জজ হিসেবে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। তখন থেকে তিনি উচ্চতর পর্যায়ের ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের (আই.এ.এস) সদস্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন ও বিচার বিভাগে কাজ করেন। রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক বিষয়কে কেন্দ্র করে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় ১৯৫০ সালে চাকরি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে পদত্যাগ পত্র দেন এবং ১৯৫১ সালে তিনি বিচার বিভাগের সচিব পদ থেকে অব্যাহতি পান।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী অন্নদাশঙ্কর রায় ২০ বছর বয়সে ওড়িয়া সাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর প্রথম কবিতা ওড়িয়া ভাষায় রচিত। কম বয়সে ***প্রভা*** নামে ওড়িয়া ভাষায় হাতে লেখা একটি পত্রিকা বের করেন। বাংলা, ইংরেজি, ওড়িয়া, সংস্কৃত, হিন্দি-সব ভাষায় পারদর্শী হলেও বাংলাকেই তিনি সাহিত্যচর্চার মাধ্যম হিসেবে বেছে নেন। তদুপরি বাড়ির ও কলেজের গ্রন্থাগারে তিনি ভারতীয় এবং ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হন। দশ-বারো বছর বয়স থেকেই তিনি শুদ্ধ শিল্পের সন্ধান করেছেন। তখন থেকেই আয়ত্ত করেন কৃত্তিবাসের *রামায়ণ*, কাশীরাম দাসের *মহাভারত*, কবিকঙ্কনের *চণ্ডীমঙ্গল*, বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাসের পদাবলী। এমনকি বাড়িতে তিনি পারসিক সাহিত্যের বই 'গোলে বকাউলি'ও পড়েন। ছাত্রজীবনেই তিনি চার্লস ডিকেন্স, বার্নার্ড শ, ইবসেন, টলস্টয় প্রমুখ লেখকের রচনা পড়ে ইউরোপীয় সাহিত্য, সমাজ ও দেশ সম্বন্ধে জানতে কৌতূহলী হন। স্কুলে তিনি

শিশু, *সন্দেশ*, *মৌচাক*, *সবুজপত্র*, *প্রবাসী*, *মডার্ন রিভিউ* প্রভৃতি পত্রিকা পড়ার সুযোগ পান। তেরো বছর বয়সে অক্সফোর্ড থেকে প্রকাশিত 'এপিফ্যানী' (Epiphany) পত্রিকার গ্রাহক হন এবং সে পত্রিকায় লেখা ছাপেন।

প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র' ছিল তাঁর লেখক হয়ে ওঠার প্রেরণা। 'সবুজপত্র' পত্রিকার দুই প্রধান লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রমথ চৌধুরীর জীবনদর্শন ও শিল্পাদর্শ অন্নদাশঙ্করের সাহিত্য-মানস গঠনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। অন্যদিকে টলস্টয়কেও তিনি আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন। টলস্টয়ের সত্যের প্রতি অনুরাগ এবং রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যপ্রীতি তাঁকে আকৃষ্ট করে। ১৬ বছর বয়সে টলস্টয়ের গল্প 'তিনটি প্রশ্ন' তিনি বাংলায় অনুবাদ করেন এবং তা 'প্রবাসী' পত্রিকায় ছাপা হয় ১৯২০ সালে। বাংলা ভাষায় তাঁর প্রথম প্রকাশিত মৌলিক রচনার বিষয় ছিল নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা, যা 'ভারতী' পত্রিকায় ছাপা হয়। এ ধরনের বিষয় নিয়ে তিনি ওড়িয়া ভাষায়ও লেখেন। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকের ওপর যে প্রবন্ধ লেখেন, তা রবীন্দ্রনাথকেও আলোড়িত করে। অন্নদাশঙ্করের প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ গ্রন্থ *তারুণ্য* ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হয় 'বিচিত্রা' পত্রিকায়। তবে তাঁর ইউরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা *পথে প্রবাসে* ভ্রমণকাহিনীর মাধ্যমেই তিনি বাংলা সাহিত্যে নিজের স্থান করে নেন। ১৯২৭ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত দুই বছর উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় *পথে প্রবাসে*। তাঁর নিজের ভাষায়-"'পথে প্রবাসের' মধ্যে আমার জীবনদর্শনকে খুঁজে পাওয়া যাবে"। (সাহিত্যিকের জবানবন্দী: অন্নদাশঙ্কর রায়, কোলকাতা ১৯৯৬)। একই সময় 'মৌচাক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর *ইউরোপের চিঠি*। অন্নদাশঙ্কর রায় কোনো গোষ্ঠীভুক্ত লেখক ছিলেন না। তবে সম্পাদকদের অনুরোধে 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'পরিচয়' প্রভৃতি পত্রিকার জন্য লেখেন। কল্লোল, কালিকলম যুগের সাহিত্যিক এবং বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ও শিখা গোষ্ঠীর প্রতিভূদের সঙ্গেও তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল।

দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রায় সত্তর বছর ধরে তিনি প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প, ভ্রমণকাহিনী, ছড়া, কবিতা, নাটক, পত্রসাহিত্য, আত্মজীবনীমূলক রচনা প্রভৃতি লিখে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস *অসমাপিকা* (১৯৩১) এবং প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস *আগুন নিয়ে খেলা* (১৯৩০)। বাংলা সাহিত্যের প্রথম এপিক উপন্যাস তাঁর ছয় খণ্ডে প্রকাশিত ***সত্যাসত্য*** ছয়টি নামে প্রকাশিত হয় যথাক্রমে- *যার যেথা দেশ* (১৯৩২), *অজ্ঞাতবাস* (১৯৩৩), *কলঙ্কবতী* (১৯৩৪), *দুঃখমোচন* (১৯৩৬), *মর্ত্যের স্বর্গ* (১৯৪০), *অপসরণ* (১৯৪২)। উল্লেখযোগ্য অন্যান্য উপন্যাস *পুতুল নিয়ে খেলা* (১৯৩৩), *না* (১৯৫১), *কন্যা* (১৯৫৩), তিন খণ্ডে প্রকাশিত *রত্না ও শ্রীমতী* (১ম-১৯৫৬, ২য়-১৯৫৮, ৩য়-১৯৭২), সুখ (১৯৬১), *বিশল্যকরণী* (১৯৬৭), *তৃষ্ণার জল* (১৯৬৯), *রাজঅতিথি* (১৯৭৮) এবং চার খণ্ডে রচিত ও প্রকাশিত *ক্রান্তদর্শী* (১ম-১৯৮৪, ২য়-১৯৮৫, ৩য়-১৯৮৫,

৪র্থ-১৯৮৬)। ছয় খণ্ডে রচিত 'সত্যাসত্য' বাংলায় মননশীল উপন্যাস রচনায় এক স্বতন্ত্র ধারা তৈরি করে। সমাজ, সভ্যতা ও ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে অন্নদাশঙ্কর জীবনের তাৎপর্য অন্বেষণ করেন এ উপন্যাসে। উপন্যাসের বিশাল পরিসরে রূপায়িত হয় আধুনিক যুগের জটিল জীবন-সমস্যা, সামাজিক, দার্শনিক, রাজনৈতিক মতবাদ ও তত্ত্ব, দাম্পত্য সম্পর্কের আধুনিক ধারণা এবং দেশ-কালের বৃহত্তর আবহ। ভারতবর্ষের সংকটকে তিনি উপস্থাপন করেছেন বিশ্বব্যাপী সংকটের পটভূমিতে। তাঁর বিশ্ববীক্ষা, সভ্যতার বিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতা ও মানবতাবাদী চিন্তাভাবনা রবীন্দ্রনাথেরই উত্তরাধিকার। এই ধারাতেই রচিত হয় 'ক্রান্তদর্শী'। চার খণ্ডে সম্পূর্ণ এই মহাকাব্যিক উপন্যাস একটি বিশেষ সময়ের ঘটনাপ্রবাহকে ধারণ করে আছে - দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরু থেকে আগস্ট বিপ্লব, পঞ্চাশের মন্বন্তর, ব্রিটিশ ও কংগ্রেস-মুসলিম রাজনীতি, দাঙ্গা, দেশভাগ ও ব্রিটিশের প্রস্থান এবং হিন্দু মহারাষ্ট্রবাদীর হাতে মহাত্মা গান্ধীর নিধন। বাংলায় এপিক উপন্যাসের পথিকৃৎ অন্নদাশঙ্কর। রঁম্যা রঁলার *জঁ ক্রিস্তফ্* থেকে তিনি এপিক উপন্যাসের ধারণা লাভ করেন। তিনি বড় মাপের উপন্যাস লিখেছেন যাকে বলা হয় মনোলিথিক আঙ্গিকের। তবে বৃহৎ উপন্যাসমালার ফাঁকে ফাঁকে বেশ কিছু ছোটগল্পও লিখেছেন। ছোটগল্প রচনায়ও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

অন্নদাশঙ্করের সাহিত্যসৃষ্টি বৈচিত্র্যপূর্ণ। কেবল আঙ্গিকে নয়, ভাববৈচিত্র্যেও তাঁর রচনা কালোত্তীর্ণ। বহুমুখী ভাবানুভূতি তাঁর রচনার বিশেষত্ব। বিষয়বৈচিত্র্যে তাঁর রচনা সমৃদ্ধ। ইতিহাস, সাহিত্যতত্ত্ব, দর্শন, সমাজ-সংস্কৃতি, রাজনীতি, সমকালীন বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহ তাঁর গদ্যের বিষয়। তাঁর সাহিত্যের এক অন্যতম অংশ প্রবন্ধ। প্রবন্ধসাহিত্যে অন্নদাশঙ্কর ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সার্থক উত্তরসূরি। তবে রবীন্দ্রযুগের লেখক হলেও তাঁর স্টাইল সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইনটেলেক্ট, ইনটুইশন ও ইনস্টিংক্ট - এই ত্রিবেণী সঙ্গমের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ অন্নদাশঙ্করের প্রবন্ধসাহিত্য। তিনি ছিলেন মুক্তচিন্তা, আদর্শবাদ ও শুভবুদ্ধির প্রতীক। দেশভাগ, দাঙ্গা ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী ছিল আজীবন সোচ্চার। কল্পনা ও যুক্তি, প্রেম ও বিবেক, স্বদেশ ভাবনা, বিশ্বচিন্তা ও বিজ্ঞানমনস্কতার সমন্বয় তাঁর প্রবন্ধসমূহ। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে: *তারুণ্য* (১৯২৮), *আমরা* (১৯৩৭), *জীবনশিল্পী* (১৯৪১), *ইশারা* (১৯৪৩), *বিনুর বই* (১ম পর্ব-১৯৪৪), *জীয়ন কাঠি* (১৯৪৯), *দেশকালপাত্র* (১৯৪৯), *প্রত্যয়* (১৯৫১), *নতুন করে বাঁচা* (১৯৫৩), *আধুনিকতা* (১৯৫৩), *সাহিত্যে সংকট* (১৯৫৫), *কণ্ঠস্বর* (১৯৫৬), *রবীন্দ্রনাথ* (১৯৬২), *প্রবন্ধ* (১৯৬৪), *খোলা মন ও খোলা দরজা* (১৯৬৭), *আর্ট* (১৯৬৮), *গান্ধী* (১৯৭০), *প্রাণ রক্ষা ও বংশ রক্ষার অধিকার* (১৯৭০), *শুভোদয়* (১৯৭২), *বাংলার রেনেসাঁস* (১৯৭৪), *শিক্ষার সংকট* (১৯৭৬), *কাঁদো প্রিয় দেশ* (১৯৭৬), *প্রেম ও বন্ধুতা* (১৯৭৬), *লালন ও তাঁর গান* (১৯৭৮), *চিত্ত যেথা ভয়শূন্য* (১৯৭৮), *বাংলাদেশে* (১৯৭৯), *সাতকাহন* (১৯৭৯), *টলস্টয়* (১৯৮০), *স্বাধীনতার পূর্বাভাস* (১৯৮০), *জাতিবৈর* (১৯৮১), *শিক্ষার ভবিষ্যৎ* (১৯৮১), *সংহতির সংকট* (১৯৮৪), *সংস্কৃতির বিবর্তন* (১৯৮৪), *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ* (১৯৮৬), *যুক্তবঙ্গের*

স্মৃতি (১৯৯০), *যেন ভুলে না যাই* (১৯৯২), *বিনুর বই* (১ম ও ২য় পর্ব একত্রে-১৯৯৩), *সাহিত্যিকের জবানবন্দী* (১৯৯৬), *সেতুবন্ধন* (১৯৯৬), *নব্বই পেরিয়ে* (১৯৯৬), *বিদগ্ধ মানস* (১৯৯৭), *মুক্তবঙ্গের স্মৃতি* (১৯৯৮), *জীবন যৌবন* (১৯৯৯), *রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও সবুজপত্র* (১৯৯৯), *নতুন করে ভাবা* (১৯৯৯), *সাহিত্যে সংকট ও অন্যান্য* (২০০০), *আমার কাছের মানুষ* (২০০১), *শতাব্দীর মুখে* (২০০১), *আমার ভালোবাসার দেশ* (২০০১) প্রভৃতি। পরিণত বয়সে এসে তাঁর প্রবন্ধে সৃষ্টিশীলতা, শিল্পকলা ও সৌন্দর্যচেতনার পাশাপাশি যুক্ত হয় নৈতিকতা, ন্যায়বোধ, যুক্তিবাদ ও বিবেকবোধ। তাঁর প্রবন্ধসম্ভার 'প্রবন্ধ সমগ্র' নামে কোলকাতার মিত্র ও ঘোষ থেকে ১২ খণ্ডে প্রকাশিত। সৃজনশীল সাহিত্য 'অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী' নামে বাণীশিল্প থেকে ১৩ খণ্ডে প্রকাশিত ।

বাংলা ছড়ার জগতে অন্নদাশঙ্কর রায় কিংবদন্তী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ছড়া লেখার পরামর্শ দেন। পরবর্তী সময়ে বুদ্ধদেব বসুর অনুরোধে তিনি ছড়া লেখা আরম্ভ করেন। তাঁর ছড়াসম্ভার বিষয়বৈচিত্র্যে তাৎপর্যপূর্ণ। ছোট-বড় সবার জন্যই তিনি ছড়া লিখেছেন। প্রধানত শ্রমজীবী বা সাধারণ মানুষের জন্য তিনি ছড়া লেখেন। সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয় থেকে শুরু করে প্রাণীজগতের ক্ষুদ্র জীবজন্তুও স্থান পেয়েছে তাঁর ছড়ায়। কখনো তীব্র শ্লেষে, স্নিগ্ধ পরিহাসে, আবার কখনো নিখাদ কৌতূকে তিনি মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের অসঙ্গতিগুলি তুলে ধরেন ছড়ার মাধ্যমে। তাঁর কিছু কিছু ছড়া ইতিহাস হয়ে গেছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য "খোকা ও খুকু"(১৯৪৭)। এতে সুর দিয়েছন বিখ্যাত সুরকার সলীল চৌধুরী। দেশবিভাগ জনিত বেদনা তীর্যকভাবে প্রকাশ পেয়েছে এই ছড়ায়:

তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো,
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো ।
তার বেলা?
ভাঙছ প্রদেশ ভাঙছ জেলা
জমিজমা ঘরবাড়ি
পাটের আড়ত ধানের গোলা
কারখানা আর রেলগাড়ি ।
তার বেলা?

কবি নজরুল ইসলামকে নিয়ে লেখা তাঁর একটি কবিতা বিখ্যাত হয়ে আছে:

ভুল হয়ে গেছে
বিলকুল
আর সব কিছু
ভাগ হয়ে গেছে
ভাগ হয়নি কো
নজরুল ।
এই ভুলটুকু
বেঁচে থাক
বাঙালী বলতে
একজন আছে
দুর্গতি তার
ঘুচে যাক । (নজরুল)

তাঁর বেশ কিছু ছড়া প্রতিষ্ঠিত সুরকারদের সুরে জনপ্রিয় গানে রূপ পেয়েছে। পঞ্চাশের দশকে তাঁর একটি ছড়া শিশুদের প্রিয় গান হয়ে ওঠে:

ময়নার মা ময়নামতী
ময়না তোমার কই
ময়না গেছে কুটুম বাড়ি
গাছের ডালে ওই ।

আধুনিক বাংলা ছড়ার জগতে অন্নদাশঙ্কর এক নতুন ধারা সৃষ্টি করেছেন। একসময়ের ছেলেভুলানো ছড়াকে তিনি উপেক্ষিত স্তর থেকে উন্নীত করেন অভিজাত সাহিত্যের শৈল্পিক স্তরে। দেশ-বিদেশের বহু ঘটনা তাঁর ছড়ার উপকরণ হয়ে এসেছে। দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনা ছাড়াও অলিম্পিক ১৯৬৪, ভিন্টেজ কার র‍্যালি ১৯৬৮, মহাশূন্যে রকেট প্রেরণ ১৯৭৩, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও বাংলাদেশ ভ্রমণ, ক্রিকেট বিশ্বকাপে ভারতের জয়, হ্যালির ধূমকেতুর উদয়, বিশ্ব টেনিস, আর্জেন্টিার ফুটবলে বিশ্বকাপ জয় ও ম্যারাডোনার গৌরব, মানুষের চন্দ্র অভিযান ও চন্দ্রে অবতরণ, রাকেশ শর্মার রকেট যাত্রা, বার্সেলোনা অলিম্পিক, কালোবাজারি ও ভেজাল, আসামে বঙ্গাল খেদা, বাজারে চালের দাম বৃদ্ধি, লোডশেডিং, জরুরি অবস্থা এবং ভারত ও বাংলাদেশের সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ তাঁর ছড়ার বিষয়বস্তু হয়েছে উচ্ছ্বাসে, কৌতূকে এবং তীব্র কটাক্ষে। দেশ ও সমাজের নানাবিধ সমস্যা, অনাচার ও অসঙ্গতি তিনি তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করেন এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান ছড়ার ভাষায়।

জীবনের অন্তিম পর্যায়ে এসে ২০০২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হাসপাতালে থাকা অবস্থায় অন্নদাশঙ্কর মুখে মুখে তাঁর শেষ ছড়া বলে যান, যা সুরজিৎ দাশগুপ্ত লিখে রাখেন। একই বছর সন্দেশ পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় 'ঐরাবত' নামে ছড়াটি প্রকাশিত হয়। তাঁর ছড়ার মধ্যে আছে কবিতা, গান, লিমেরিক, ব্যালাড, এমনকি নাটকের সংলাপও। তাঁর ছড়াসমগ্র-তে প্রকাশিত মোট ৫৬৪টি ছড়ার মধ্যে ছোটদের ২৬টি এবং বড়দের ২৯৮টি। তিনিই বাংলায় প্রথম লিমেরিক রচনা করেন। আধুনিক বাংলা ছড়ায় যে বৈচিত্র্য দেখা যায়, তার সূত্রপাত করেন অন্নদাশঙ্কর। বিখ্যাত ছড়ার বই: *উড়কি ধানের মুড়কি* (১৯৪২), *রাঙা ধানের খৈ* (১৯৫০), *ডালিম গাছে মৌ* (১৯৫৮), *শালি ধানের চিঁড়ে* (১৯৭২), *আতা গাছে তোতা* (১৯৭৪), *হৈ রে বাবুই হৈ* (১৯৭৭), *ক্ষীর নদীর কূলে* (১৯৮০), *হট্টমালার দেশে* (১৯৮০), *ছড়াসমগ্র* (১ম সং. ১৯৮১), *রাঙা মাথায় চিরুনি* (১ম সং. ১৯৮৫), *বিন্নি ধানের খই* (১৯৮৯), *কলকাতা পাঁচালী* (১৯৯২), *ছড়াসমগ্র* (২য় পরিবর্ধিত সং. ১৯৯৩), *সাত ভাই চম্পা* (১৯৯৪), *যাদু এ তো বড় রঙ্গ* (১৯৯৪),) *খেয়াল খুশির ছড়া* (১৯৯৭), *দোল দোল দুলুনি* (১৯৯৮) ইত্যাদি। তাঁর প্রথম ছড়া প্রকাশিত হয় *মৌচাক* শিশু পত্রিকায়। ছড়াসমগ্র-তে প্রকাশিত প্রথম ছড়া 'লন্ডন ফগ' ১৯২৭ সালে রচিত। তাঁর ছড়ার সুর মূলত লোকায়ত এবং লোক-ছড়ার পঙক্তির আশ্রয় নিয়েছেন অধিকাংশ ছড়ার নামকরণে।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের উপন্যাসের সংখ্যা প্রায় ২২টি, গল্প সংকলন ১২টি, মোট গল্পের সংখ্যা ৯১টি, কবিতার বই ৬টি, ছড়া সংকলন ১৭টি। এ ছাড়া আছে প্রবন্ধ সংকলন, ভ্রমণকাহিনী, ভাষণ, কিশোর সাহিত্য, নাটক, চিঠিপত্র, আত্মজীবনমূলক ও আত্মশিল্পমূলক নিবন্ধ এবং মৌলিক ইংরেজি প্রবন্ধ নিয়ে প্রকাশিত বেশ কয়েকটি গ্রন্থ। আরও রয়েছে অসংখ্য অপ্রকাশিত, অগ্রন্থিত কবিতা ও ছড়া। জীবনের পর্বে পর্বে তাঁর শিল্পীসত্তার বিবর্তন ঘটে। একজন বুদ্ধিজীবী ও মননশীল লেখক হয়েও তাঁর জীবনজিজ্ঞাসা ও সাহিত্যজিজ্ঞাসার মূল বৈশিষ্ট্য সত্য, সৌন্দর্য ও প্রেম। দেশি, বিদেশি, সমসাময়িক ও চিরকালীন মনীষীদের নিয়ে লেখা স্মৃতিচিত্রধর্মী নিবন্ধগুলি একদিকে সরস ও মর্মস্পর্শী, আবার অন্যদিকে সামাজিক-ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। গ্যেটে, টলস্টয়, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, রম্যাঁ রঁলা, রাসেল, লালন শাহ, প্রমথ চৌধুরী, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, শরৎচন্দ্র এবং আরও বহু মনীষীকে নিয়ে লেখা রচনাগুলির মধ্য দিয়ে দেশ-কাল-পাত্রের রূপচিত্র ও সত্য প্রতিভাত হয়ে ওঠে।

অন্নদাশঙ্করের উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ: *প্রকৃতির পরিহাস* (১৯৩৪), *দুকান কাটা* ১৯৪৪, *হাসনসখী* (১৯৪৫), *মনপবন* (১৯৪৬), *যৌবনজ্বালা* (১৯৫০), *কামিনীকাঞ্চন* (১৯৫৪), *রূপের দায়* (১৯৫৮), *গল্প* (১৯৬০), *কথা* (১৯৭১), *কাহিনী* (১৯৮০), *শ্রেষ্ঠগল্প* (১৯৮৪) এবং *গল্পসমগ্র* (১৯৯৯)।

১৯২২ থেকে ১৯২৬ সালের মধ্যে তিনি ওড়িয়া ভাষায় সাহিত্য রচনা করেন যার মধ্যে রয়েছে ১৪টি কবিতা, ২২টি প্রবন্ধ, *স্বপ্ন* নামে একটি গল্প এবং কয়েকটি চিঠিপত্র। তাঁর

এসব রচনা 'উৎকল সাহিত্য', 'সহকার', 'সবিতা' প্রভৃতি পত্রিকায় এবং পরবর্তী সময়ে *সবুজ অক্ষর* (১৯৬৬) শিরোনামের পুস্তকে প্রকাশিত হয়। 'সবুজদল' নামে একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে ওঠে, যার সঙ্গে অন্নদাশঙ্কর যুক্ত ছিলেন। ওড়িয়া সাহিত্যের 'সবুজ যুগ' অধ্যায়ে তাঁর নামও অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া 'বাসন্তী' (১৯৩১) নামের ওড়িয়া উপন্যাসের আদি তিনটি অধ্যায় তাঁর রচিত। ওড়িয়া ভাষায় অন্নদাশঙ্করের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত ও আলোচিত হয়।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের ইংরেজি রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য: Bengali Literature (১৯৪২), Flight and Pursuit (১৯৬৮), Yes, I Saw Gandhi (১৯৭৬), Companion on the Road (কবিতার অনুবাদ-১৯৭৬), A Writer Speaks (১৯৭৭), Woman and Other Stories (গল্পের অনুবাদ-১৯৭৭), An Outline of Indian Culture (১৯৭৮) , Aspects of Indian Culture (১৯৮৩), In Restrospect (১৯৮৯), Tolstoy Goethe and Tagore (১৯৯৯), Selected Short Stories (গল্পের অনুবাদ-১৯৯৯).

অন্নদাশঙ্কর রায় জীবন, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে অসংখ্য ভাষণ দেন, তার মধ্যে কিছু কিছু বিভিন্ন গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত। তিনি বেশ কয়েকটি সমাবর্তন ভাষণ প্রদান করেন, যার মধ্যে রয়েছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (২৯ ডিসেম্বর ১৯৭৮), বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তি নিকেতন (৭ এপ্রিল ১৯৮৯), কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় (৯ মে ১৯৮৯), কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩) এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (৭ মে ১৯৯৪)। এই ভাষণগুলি ইংরেজিতে প্রদত্ত এবং তিনি এর বাংলা অনুবাদ করেন নি, অন্য কেউ অনুবাদ করুক তাও চান নি।

রবীন্দ্রোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী অন্নদাশঙ্কর রায়। তিনি সমসাময়িক ভারতবর্ষের একজন অন্যতম চিন্তাবিদ। তাঁর চিন্তাধারা বিশ্বজনীন। ইউরোপের অভিজ্ঞতা তাঁকে করেছে বিশ্বনাগরিক। তাঁর মধ্যে দেখা যায় জীবন ও শিল্পের এক নান্দনিক সমীকরণ। তাই তিনি একই সঙ্গে মরমী ও যুক্তিবাদী। তাঁর রচনাও তাই সাহিত্যিক ও সামাজিক, সমসাময়িক ও যুগোত্তীর্ণ, সাবজেকটিভ ও অবজেকটিভ, সাহসী ও মরমী। রবীন্দ্রনাথ ও টলস্টয়ের কাছ থেকে তিনি গ্রহণ করেছেন বিশুদ্ধ শিল্পাদর্শ, অন্যদিকে গান্ধীর প্রভাব তাঁকে করেছে গণমানুষের প্রতি দায়বদ্ধ ও সমাজমনস্ক। অন্নদাশঙ্করের ধর্মবিশ্বাস ছিল ব্যতিক্রমধর্মী-সব ধর্মের সার সংগ্রহকারী একেশ্বরবাদী ধর্ম। শেষ বয়সের লেখা 'জীবন যৌবন' গ্রন্থে তিনি নিজের এই জীবনদর্শনের কথা উল্লেখ করেন। নিজেকে তিনি একজন 'Non-conformist' বলে অভিহিত করেন। অর্থাৎ তাঁর মধ্যে প্রচলিত ধর্মের রীতি, বিধান, সংস্কার এসব ছিল

না, তবে সব ধর্মের প্রতি তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। তিনি ছিলেন সৎ, বিবেকবান ও মানবধর্মে বিশ্বাসী একজন প্রতিভাধর মানুষ। অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে তিনি আমৃত্যু লালন করে গেছেন।

চাকরি ছাড়ার পর অন্নদাশঙ্কর রায় শান্তিনিকেতনে বসবাস শুরু করেন। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য বাঙালির আত্মদান তাঁর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। পরের বছর ১৯৫৩ সালে তিনি এক ঐতিহাসিক 'সাহিত্য মেলা'র আয়োজন করেন শান্তিনিকেতনে। তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে এই সাহিত্য মেলায় যোগ দেন কাজী মোতাহার হোসেন, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, শামসুর রাহমান, কায়সুল হক এবং আরও অনেকে। দুই বাংলার সাহিত্যিকদের সেই মিলনমেলা সার্থক হয়েছিল। অন্নদাশঙ্করের শান্তিনিকেতনের বাড়িতে নিয়মিত 'সাহিত্য সভা' হতো এবং সেখানে আশ্রমের সাহিত্য রসিকদের সমাবেশ ঘটত। এ ছাড়া দেশি-বিদেশি বহু পণ্ডিত তাঁর বাড়িতে অতিথি হয়ে আসতেন। নানা দেশের নানা ভাষার মানুষের সমাগমে সেখানে এক আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল তৈরি হতো । শান্তিনিকেতনে অবস্থানকালে অন্নদাশঙ্কর বিশ্বভারতীর কর্মসমিতির সদস্য ছিলেন। ষাট দশকের শেষ দিকে পারিবারিক কারণে কোলকাতায় এসে বসবাস শুরু করেন তিনি এবং এরপর সেখানেই স্থায়ীভাবে থেকে যান।

ব্যক্তিগত জীবনে অন্নদাশঙ্কর ছিলেন মিতচারী। জীবন-যাপনের সব ক্ষেত্রে তিনি দেশী রীতি পালন করতেন। আমেরিকান তরুণী অ্যালিস ভার্জিনিয়া ওর্নডর্ফ-এর সঙ্গে বিয়ে তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। টেকসাসের বিদুষী তরুণী অ্যালিস ভার্জিনিয়া ওর্নডর্ফ ১৯৩০ সালে ভারতে আসেন ভারতীয় সঙ্গীত বিষয়ে গবেষণার জন্য। কোলকাতার লেখক ভবানী মুখোপাধ্যায়ের মাধ্যমে অ্যালিসের সঙ্গে অন্নদাশঙ্করের পরিচয় ঘটে এবং পরবর্তী পর্যায়ে তাঁরা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁদের বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন প্রমথ চৌধুরী, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, গোপালদাস মজুমদার, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক। সে সময় অন্নদাশঙ্কর 'লীলাময় রায়' ছদ্মনামে লিখতেন। নবদম্পতি কবিগুরুর সঙ্গে দেখা করতে যান শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথ অন্নদাশঙ্করের ছদ্মনাম লীলাময় রায়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অ্যালিসের নতুন নামকরণ করেন লীলা রায়। অন্নদাশঙ্করের জীবনে লীলা রায়ের প্রভাব ব্যাপক। বহু ভাষায় পারদর্শী লীলা রায় নিজেও সাহিত্যিক এবং অনুবাদক হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। নানাবিধ গুণের অধিকারী এই মার্কিন কন্যা বাঙালি রমণীর মতোই জীবন যাপন করেছেন। যোগ দিয়েছেন গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে; চরকা কাটেন, খাদি পরেন এবং মানুষের কল্যাণে নিবেদিত থাকেন আজীবন। তিনি অন্নদাশঙ্কর রায়সহ বহু বাঙালি লেখকের রচনার অনুবাদ করেন ইংরেজিতে। সত্যজিৎ রায়ের অশনি সংকেত, ঘরে-বাইরে এবং আরও কিছু ছবির ইংরেজি সাব-টাইটেল করেন লীলা রায়। ১৯৯২ সালের ৬ অক্টোবর লীলা রায়ের মৃত্যু হয়। অন্নদাশঙ্কর ও লীলা রায়ের তিন পুত্র ও দুই কন্যার মধ্যে এক পুত্র অকালে মারা যায়। বড় পুত্র পূন্যশ্লোক রায় পিতার আগেই মারা

যান। বাকিদের মধ্যে আছেন ছোট পুত্র আনন্দরূপ রায়, কন্যা জয়া রায় ও তৃপ্তি রায় এবং তাঁদের সন্তানেরা।

বাংলাদেশকে অন্নদাশঙ্কর বরাবরই নিজের দেশ হিসেবে দেখেছেন। বাংলার মানুষের সুখ-দুঃখ, রাজনৈতিক টানাপোড়েন তাঁকে বিচলিত করত। কর্মসূত্রে পূর্ববঙ্গে অতিবাহিত করার সময় এখানকার সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, ভূমিব্যবস্থা এবং ধর্মীয় সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর সম্যক ধারণা গড়ে ওঠে। জীবনের এ পর্বের অভিজ্ঞতা তাঁর ছোটগল্প, ছড়া ও প্রবন্ধে প্রতিফলিত। বাংলা ভাষা ও বাংলা ভাষাভাষী মানুষের প্রতি তাঁর দরদ ও সমমর্মিতা আজীবন অটুট ছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর অন্নদাশঙ্কর দু'বার এদেশে আসেন সরকারের অতিথি হিসেবে - প্রথমবার ১৯৭৪ সালে এবং দ্বিতীয়বার ১৯৯৬ সালে।

অন্নদাশঙ্কর রায় সাহিত্য আকাদেমির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও ফেলো ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমির জন্মকাল ১৯৮৬ সাল থেকে তিনি ছিলেন এর আজীবন সভাপতি ও পথিকৃৎ। সাহিত্যকর্মের জন্য তিনি বহু পুরস্কারে ভূষিত হন। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে *জগত্তারিণী* পুরস্কারে ভূষিত করে ১৯৭৯ সালে। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে প্রদান করে *দেশিকোত্তম* সম্মান। বর্ধমান, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক *ডি.লিট* প্রদান করে। অন্যান্য পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে *সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার* (১৯৬২), *আনন্দ পুরস্কার* (দুইবার-১৯৮৩, ১৯৯৪), *বিদ্যাসাগর পুরস্কার, শিরোমণি পুরস্কার* (১৯৯৫), '*রবীন্দ্র পুরস্কার*', '*নজরুল পুরস্কার*', বাংলাদেশের '*জেবুন্নিসা পুরস্কার*'।

অন্নদাশঙ্কর রায় ছিলেন নির্মোহ, সতত সক্রিয়, সমাজমনস্ক এবং মানবধর্মে বিশ্বাসী একজন সার্থক শিল্পী ও সমাজদার্শনিক। চিন্তায়, কাজে, মননে, প্রজ্ঞায়, উদারতায় আর মহত্ত্বে তিনি এক বিশ্বমানব। যে মানুষকে খুঁজেছেন রবীন্দ্রনাথ আর লালন শাহ, সেই নিখাদ শুদ্ধ মানুষটিরই অধিবাস তাঁর মধ্যে। চন্ডীদাসের বাণী "সবার উপরে মানুষ সত্য"-এটা ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব ধর্মের মানুষকে তিনি সমান মর্যাদায় দেখেছেন। বার্ধক্যজনিত কারণে অসুস্থ হলেও জরা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি। জীবনের শেষ দিনগুলিতেও তিনি ছড়া লিখেছেন এবং মুখে মুখে বলে গেছেন স্মৃতিকথা। ২০০২ সালের ২৮ আগস্ট এই জীবনশিল্পীর জীবনাবসান ঘটে কোলকাতার পি.জি হাসপাতালে।

[বাংলাপিডিয়া দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশিত]